কালের কণ্ঠ

তারিখ ..07 DEC 2015...
পৃষ্ঠা ...১৮... কলাম ...৪...

নদীতে বিলীন স্কুল ভবন, তিন বছর ধরে চলছে এভাবেই পড়াশোনা। ছবি : কালের কণ্ঠ

নদীর বুকে পাঠশালা

শফিক আদনান, কিশোরগঞ্জ ▷

হাওরের মাঝখানে স্থানীয় একটি সমিতির কার্যালয়। সেখানে নিয়মিত সমিতির কাজকর্ম হয়। ওই কার্যালয়ের নেই কোনো দরজা-জানালা। নেই চেয়ার-টেবিল কিংবা বেঞ্চ। কিন্তু কার্যালয়টির বারান্দাটিই ব্যবহৃত হচ্ছে কোমলমতি শিশুদের পাঠশালা হিসেবে। মেঝেতে বসেই পড়াশোনা তাদের। তবে ঝড়-বৃষ্টির দিনে বন্ধ থাকে স্কুল। তা ছাড়া শীতকালে ঠাণ্ডার কারণে স্কুলে যেতে চায় না শিক্ষার্থীরা। এমন চিত্র কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জের চংনোয়াগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের।

জানা গেছে, ১৯৬৬ সালে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০১২ সালের এপ্রিলে বিদ্যালয়ের কিছু অংশ নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেলে সেটি পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়। ২০১৩ সালের জুনে ধনু নদীতে পুরো বিদ্যালয়টি বিলীন হয়ে যায়। পরে এলাকাবাসী একটি টিনশেড ঘর নির্মাণ করে শিক্ষা কার্যক্রম চালু রাখলেও গত বছর ঝড়ে সেটিও ভেঙে যায়। তারপর স্থানীয় একটি সমিতির কার্যালয়ে শুরু হয় ২২৮ জন শিক্ষার্থীর পাঠদান। কিন্তু প্রতিকূল পরিবেশে কোমলমতি শিশুরা পড়াশোনায় আগ্রহী না হওয়ায় ধীরে ধীরে শিক্ষার্থী সংখ্যা কমতে শুরু করে। এতে করে বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে হাওর এলাকার প্রাথমিক শিক্ষা।

এ ব্যাপারে চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী প্রীতি আক্তার জানায়, সমিতির লোকজন যখন আসে, তখন তাদের ক্লাস করতে হয় সভাপতির বাংলা ঘরে। সেখানে পর্যাপ্ত আলো না থাকায় কিছুই দেখা যায় না। ধুলাবালিতে জামা-কাপড় নষ্ট হয়ে যায়। এভাবে লেখাপড়া করতে ভালো লাগে না। তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রী ঝুমা ও দ্বিতীয় শ্রেণির আনোয়ার জানায়, 'মাটিত (মেঝে) বইয়া ফড়ন লাগে। বিষ্টির দিন বই-খাতা বিজ্যা (ভিজে) যায়। নৌকা দিয়ে আওন (আসা-যাওয়া) লাগে। তাই স্কুলে আইতাম মন চায় না।' তারা আরো জানায়, শুধু বেঞ্চ, চেয়ার-টেবিলের

করিমগঞ্জের চংনোয়াগাঁও স্কুল

সমস্যা নয়, আশপাশে একটি টয়লেট বা নলকূপ পর্যন্ত নেই। নেই কোনো খেলার জায়গা। টয়লেট ব্যবহারের জন্য মানুষের বাড়িঘরে গেলে তারা রাগারাগী করে।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. রফিকুল ইসলাম বলেন, আগে বিদ্যালয়টি ছিল গ্রামের সঙ্গে লাগোয়া। নদীভাঙনে গ্রামের কিছু অংশসহ বিদ্যালয়টি বিলীন হয়ে যাওয়ায় স্থানীয় রাঙামাটি খালপানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির কার্যালয়ে কোনো রকমে শিক্ষা কার্যক্রম চলছে। ঘরটি খোলা হওয়ায় বর্ষা ও শীতে ক্লাস নেওয়া যায় না। তখন ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে আসে না বলেও জানান তিনি।

বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি মো. ওয়াহেদ আলী ভূঁইয়া বলেন, হাওর এলাকার শিশুরা ভৌগোলিক কারণে এমনিতেই বিভিন্নভাবে বৈষম্যের শিকার। পড়াশোনায় পিছিয়ে গেলে তাদের মেধা-মননের সঠিক বিকাশ হবে না। তাই বিদ্যালয় ভবনটি জরুরি ভিত্তিতে নির্মাণ করা না হলে শিশুরা আরো পিছিয়ে যাবে।

চংনোয়াগাঁও গ্রামের বাসিন্দা মো. উসমান বলেন, তিন বছর ধরে গ্রামের ছাত্রছাত্রীরা কষ্ট করে পড়াশোনা করছে। এ কারণে বেশ কিছু শিশু স্কুল ছেড়ে চলে গেছে। শিশুরা আনন্দঘন পরিবেশে লেখাপড়া করতে চায়। তিনি আরো বলেন, নতুন ভবনের জন্য জায়গার কোনো সমস্যা নেই। উদ্যোগ নেওয়া হলে প্রয়োজনের বেশি জায়গা দিতে প্রস্তুত রয়েছে এলাকার লোকজন।

করিমগঞ্জ উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা আবদুস সামাদ আকন্দ বলেন, 'নতুন ভবন নির্মাণের জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে অনেক আগেই। আশা করছি, শিগগিরই এ ব্যাপারে সুসংবাদ পাওয়া যাবে।' জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. গোলাম মাওলা বলেন, শুধু চংনোয়াগাঁও নয়, জেলার ১৩ উপজেলার ধ্বংসপ্রাপ্ত ও জরাজীর্ণ বিদ্যালয়গুলোর অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য মহাপরিচালকের কাছে চিঠি দেওয়া হয়েছে। অনুমোদন পাওয়া গেলে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এ বিদ্যালয়টির নতুন ভবন নির্মাণ করা হবে।